Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

৪৭ বর্ষ ❀ জুন ❀ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সংখ্যা ❀ ২০১০ ❀ ১১শ সংখ্যা

পারমার্থিক

মাসিক পত্রিকা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীবলরাম

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা -3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোন ঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) ফোন ঃ- 235054 STD-03220
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম,কুলুশীর্ষা,কুড়মিঠা,বীরভূম(পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), ফোন-06752-2310671
১৩। আর্ত্তাশ্রম, পুরী,
১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্ত্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001
বিহার ফোন-2225116 STD-0631
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন,
মথুরা- 281121 ফোন-2444153 STD-0565
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৩। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ফোন-276917 STD-03224
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড
জেলা-মথুরা, ইউ পি,
পিন-281504, মোঃ 9760525082
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর), গুয়াহাটী-৮,
ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	২০৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	২০৪
৩। হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	২০৬
৪। শ্রীল আচার্য্যপাদের শততম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মহোৎসব	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	২০৮
৫। পারমার্থিক-প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	২১১
৬। স্নানযাত্রা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	২১৩
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহিত	২১৪
৮। আশয় ও আশ্রয়	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	২১৬

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৭ বর্ষ ☙ জুন ☙ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সংখ্যা ☙ ২০১০ ☙ ১১শ সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

জীব কি পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে?

"জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অপরিণত; কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মে কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভেদ আছে।
—*তঃ সূঃ, ১৩ সূঃ*

কোন্ সময় জীব শান্তি লাভ করিতে পারে?

"জীব যে-কাল-পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্ব্বল, অক্ষম, ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার আর শোক থাকে না।"
—*তঃ সূঃ, ১৩ সূঃ*

ভগবদ্বহির্ম্মুখ কাহারা?

"কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদয় হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞানকর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহু দেবসেবী, ধর্ম্মী, নির্ব্বেদজ্ঞান-পিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র-বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভগবদ্বহির্ম্মুখ।"
—*'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১/৬*

বিষয়ী কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চেষ্টায় পার্থক্য কি? কোন্ সময় জীব অন্তর্ম্মুখ হয়?

"এই দেহের ইন্দ্রিয়-তর্পণই বিষয়-চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্ম্মীর চেষ্টা। নিজের কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়াই জীব অন্তর্ম্মুখ হয়।"
—*'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ভক্ত ভজনীয় বস্তুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তাঁহার সেবা করেন। ভগবদ্ভক্ত বলেন—ভগবান্ প্রাকৃত দর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা সঙ্গীত, নাসাদ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা রস, ত্বক্দ্বারা স্পর্শ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র মালিক তিনি। ভগবদ্ভক্ত নিজের সেবাময় নিত্য স্বরূপটি ভগবানের দৃশ্য পদার্থরূপে উপস্থিত করেন। ভগবান্‌কে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না; এই কার্য্যটিকে তিনি আত্মভোগ বলিয়া জানেন; ভগবান্ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, এইটি ভক্তের ইচ্ছা। ভগবদ্ভক্ত ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীর সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। নিজে 'বাহবা' পাইবার জন্য নহে। ভগবানের শ্রুতি সুখ উদয় করিবার জন্য। ভগবানের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধনের জন্য তিনি যাবতীয় সুগন্ধিদ্রব্য লইয়া তৎসমীপে গমন করেন। ভগবানের রসনেন্দ্রিয়ের তর্পণের জন্য যাবতীয় সু-স্বাদু দ্রব্য ভগবানে নিবেদন করেন; সচ্চিদানন্দ বস্তুর নিত্যত্ব উপলব্ধির বিষয় হইলে ভক্ত নিজের নিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যকাল নিত্যপ্রভুর আনন্দবিধান-সেবায় নিযুক্ত হন। তিনি দর্শনীয় জগৎ, শ্রবণী জগৎ—ইত্যাদি বিচারকে বহির্ম্মুখ অবস্থা বলিয়া জানেন। নিজেকে বিষয়-জ্ঞানে জগৎকে আশ্রয় বিচার করিলে—নিজে ভোক্তা সাজিয়া, জগৎকে 'আমার ভোগ্য' জ্ঞান করিলে, ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা হইল—ভগবানের সেবা হইল না। আত্মভোগ যখন প্রয়োজনীয় নহে, ভোগে যখন সুখ পাওয়া যায় না, তখন কেহ কেহ ভোগ ছাড়িয়া ত্যাগের পথ অবলম্বন করে—আলস্যপরায়ণ হয়। চক্ষুর্দ্বারা দেখিব না, কাণ বন্ধ করিয়া রাখিব—কিছুই শুনিব না, নাসায় যাহাতে কোনও গন্ধ প্রবেশ না করিতে পারে, তজ্জন্য যত্ন করিব; খাওয়া বন্ধ করিয়া কঙ্কালসার হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব—ইহাই ত্যাগীদের বিচার। এই দুইটির কোনটিও বরণীয় নহে। যাহা ভগবৎসেবার বাধক, তাহা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিব; যাহাতে সেব্য হয়, তাহা যত্নের সহিত গ্রহণ করিব।

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জান্‌তে দেই না গোপনে যে-সকল কথা রেখে দেই, প্রকৃত সাধু সেসকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বে'র ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হ'চ্ছে,—তিনি একটি খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দাঁড়িয়ে র'য়েছেন—মানুষের ছাগের ন্যায় যে বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পুরুষ ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি মন্দকারী, আমার শত্রু।

ভাগবত-জীবন যাঁ'র নয়, তাঁ'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। ''কৃষ্ণে মতি হউক''—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ ক'রে থাকেন। ''কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক''—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

জাগতিক দ্রব্যগুলির অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং ঐগুলি প্রয়োজনীয় নয়, ইহা না বু'ঝ্‌লে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভগবদনুগ্রহ কেবল জাগতিক সুখসমৃদ্ধির জন্য—জীবের যদি এরূপ জ্ঞান হয়, তা'হলে জীব জাগতিক ভোগে ব্যস্ত থে'কে সেবাবিমুখ হয়ে যায়। ভগবৎসেবা-বিচার উপস্থিত হ'লে কেবলমাত্র স্বর্গ-সুখভোগ বা পার্থিব সুখপ্রাপ্তিতে আবদ্ধ থাকি না, যা'তে ভগবানের সুখবিধান হয়, সেই কার্য্য করার চেষ্টা হয়। বিষ্ণু কামদেব, তাঁ'রই সব। তাঁ'র কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু বিমুখব্যক্তিগণের তা'তেই প্রয়াস। শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নী গ্রহণ ক'রেছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁ'কেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবাবিমুখতা হ'তে লক্ষ্মীহরণ-পিপাসা আসে। 'শ্রীকূর্ম্মের' শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা না ক'রলে, জাগতিক সৌভাগ্য লাভ ক'রে সেবা-বিমুখ হ'য়ে যাই। সেটি অমঙ্গলের কথা।

এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের মায়ামৃগ হইয়া বিচরণ করিতেছে। এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া সঙ্ঘর্ষই এই জগতের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য এখানে সঙ্ঘর্ষের মধ্যে একটি মিলন বা ঐক্যতানের জন্য মানবের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।

প্রেয়ঃ অর্থাৎ আপাততঃ যাহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অনেকে তাহাকে মিলন বা ঐক্যতানের সূত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে সঙ্ঘর্ষের ব্যবধান বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমরা কেবল বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিয়াছি, এই অভিজ্ঞতা লইয়াই অন্তিমকালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগকে ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

প্রত্যক্ষের পথ এই প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃই যে সকলের একমাত্র মঙ্গলোৎপাদক, তাহা শ্রবণের পথে অর্থাৎ শ্রুতির মধ্য হইতে জান্‌তে পাওয়া যায়। যে পর্য্যন্ত না আমরা শ্রুতির পথ বরণ করি, সে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞান প্রেয়ঃকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের যোগ্য মিত্র বলিয়া বরণ করিয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষের পথ হইতে বহুধর্ম্মের দোকান জগতে সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ঐসকলকে মনোধর্ম্মের পণ্যবীথিকা বলা যায়। তাহাতে অনেক আপাত চাকচিক্যযুক্ত মনোহারী জিনিষ পাওয়া যায়। তাহা অতি সহজেই বিশ্বমানবের স্বাভাবিকী বহির্ম্মুখী বৃত্তিগুলিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জগতে এইরূপ মনোধর্ম্মের শত-শতপ্রকার দোকান এবং উহাদের বিভিন্ন প্রলোভনের বাগ্‌বৈখরী, উহাদের মানবজগতের প্রতি প্রস্তাবিত শান্তিপ্রদানের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদের মাথা গুলাইয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি না—স্থির করিতে পারি না, কোন্ দোকানের কোন্ জিনিষটি গ্রহণ করিব।

যে কথাটি স্বয়ং হরি, তাহাই হরিকথা; যাঁহার কথাই হরি, তিনিই হরিকথা-কীর্ত্তনকারী। হরিকীর্ত্তন ও হরিবিতরণ একই জিনিষ। হরিজন উপদেশাকারেই কথারূপী হরিকে দান করেন এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রণত সজ্জনগণ শুশ্রূষু হইয়া সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করেন। কৃষ্ণবিতরণই ভক্তের দান এবং সেবার জন্য সেই শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণকে গ্রহণই শিষ্যের কৃত্য। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটি অধোক্ষজবস্তু, আমাদের জানার অতীত তত্ত্ব। তাঁহাদিগকে কেহ জানিয়া বা মাপিয়া লইতে পারে না। তাঁহারা অন্তর্দেবতা। অন্তর্দ্দর্শন না হইলে অন্তর্দেবতার সাক্ষাৎ মিলে না। বহির্দ্দর্শনই কুদর্শন বা মায়া। তাহার অপর নাম ভোগ্যদর্শন, আর অন্তর্দ্দর্শন—সেব্যদর্শন, তাহাই সুদর্শন বা ভক্তি।

হরিকথা শুনতে হয় হরিজন গুরুদেব ও গুরুর সহিত এক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণবের নিকট। গুরুবৈষ্ণবের সম্পূর্ণ অনুগত জনগণও হরিকথা কীর্ত্তন করতে পারেন। তাঁরা গুরুবৈষ্ণবের কথাই বলেন, নিজেদের কোন কথাই বলেন না সেইজন্যই তাঁদের কথাও হরিকথা। মণিঅর্ডার, পত্রাদি পোষ্টমাষ্টারের নিকটই আসে এবং পোষ্টমাষ্টারের আদেশে পিয়ন তা অবিকল বিলি করেন।

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজক আরও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবান্‌ও পূজা করে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী শ্রীগুরু পাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা করে থাকেন, তাঁর পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশী।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বড়। গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না, আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না, যখন আমরা মনে করি, অন্যপ্রকার আকর হতে আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হবে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষ বিশেষে গুরুতত্ত্বদর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্‌গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হয়েছিলেন। কিন্তু আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্‌গুরুতত্ত্ব মহান্তগুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হয়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা হলে আমি বহুদিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ আচার-প্রচার ধরতে পারি না—'সর্ব্বস্বং গুরুবে দদ্যাৎ' এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হতে উদ্ধার পেতে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হতে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তা হলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রদান করেন।

—০—

হরিকথা প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্। ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন না। কিন্তু ভগবদ্‌বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক—ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—সকলেই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত-দৃষ্টি করেন না। শুদ্ধভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদদৃষ্টি করিলেও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥

গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও লিখিয়াছেন,—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু ॥
(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

শ্রীশচীনন্দন-ধনে শ্রীনন্দ-নন্দন সনে
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী শ্রীনরোত্তম ঠাকুরও লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণের ঝারি করি' রাধাকুণ্ডে জন পুরি',
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমরা গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট থাকিব, তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানি-মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম করিব, শব্দব্রহ্ম শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আলোচনা করিব, অসৎসঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে দূরে থাকিব। শ্রীগুরুদেব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি শিষ্যকে কৃষ্ণসেবোপকরণ জ্ঞান করেন। তাঁহার আদৌ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই; তিনি নিজ সুখের জন্য শিষ্যের কোন সেবা গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীগুরুদেব শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার যাবতীয় সেবানুকূল্যে করাইয়া নিজে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ প্রকট ও সর্ব্বতোভাবে বিস্তারের জন্যই শ্রীগুরুদেবের শিষ্যকরণ-লীলা—এইসকল কথা মর্ম্মে উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা কৃপা ভিক্ষা করিব। আমরা কখনও শুদ্ধ বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিব না, ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার ন্যায় গুরুদাস বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া গুরুসেবার বাহাদুরী দেখাইতে যাইব না। বৈষ্ণবের সঙ্গ-সৌভাগ্য হইলেই গুরুপাদপদ্মে অচলা শ্রদ্ধা হইবে—গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অপসারিত হইবে এবং তাঁহার কৃপাতে আমি গুরুসেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব। বৈষ্ণবই গুরুনিত্যানন্দের সন্ধান দিয়া জীবের প্রতি কৃপা করেন। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত গুরুকৃপা-লাভের আশা সুদূর-পরাহত। বৈষ্ণবই আমার একমাত্র বন্ধু। তিনি বড় দয়াল। তিনি গুরুসেবা-দাতা। এই গুরুদেবের কৃপাপ্রাপ্ত গুরুদাস বৈষ্ণবের সঙ্গ না হইলে গুরুতে প্রীতি, গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা ত' দূরের কথা, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিও যাইবে না। তবে একটি কথা—বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সমান জ্ঞান অথবা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের সমান জ্ঞান করিতে হইবে না। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিবার জন্য গুরুদেবের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় যেমন গুরুদেবের সন্ধান পাওয়া যায়, গুরুদেবের কৃপায়ও সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণবের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই বৈষ্ণবের সেবা সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের উপদেশানুসারে চলিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্তুষ্ট হইবেন। বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে করিতে আমরা শুদ্ধচিত্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছা ও প্রেরণা

উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যেরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছান যায়, বৈষ্ণবের কৃপায়ও সেইরূপ গুরুপাদপদ্মে পৌঁছান যাইবে। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—এই তিনটির যে-কোন একটির প্রতি অশ্রদ্ধা হইলেই বিপদ্। গুরুদেবতাত্ম বৈষ্ণবের সঙ্গ হইলেই গুরুদেবতাত্ম হওয়া যাইবে, সন্দেহ নাই; নতুবা বিপদ্ পদে পদে।

কৃষ্ণই আনন্দ। তাঁহাতেই পূর্ণানন্দ আছে। তিনি পূর্ণানন্দময়-বিগ্রহ। অখণ্ড বা পূর্ণ আনন্দ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র নাই। এই আনন্দপ্রয়াস বা কৃষ্ণসেবাই আত্মার ধর্ম্ম। আত্মার ধর্ম্মে যে আনন্দের প্রয়াস, তাহাই কৃষ্ণসেবা; আর মনে যখন আনন্দের প্রয়াস হয়, তখনই জীব ভোগে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। বদ্ধমনই মনে করে যে কৃষ্ণপাদপদ্মে কিছু ভোগের জিনিষ আছে। এই মনটাই ভোক্তা—দ্রষ্টা। যেখানে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন, সেইখানেই প্রাকৃতদর্শন বা ভোগ্যদর্শন। এই প্রাকৃত-দর্শন সম্যগ্‌ভাবে ত্যাগ করাই সন্ন্যাস। সন্ন্যাসে কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভোগের কোন কথা নাই; সেখানে কায়, মন ও বাক্য সতত ভগবৎসেবাতৎপর। মনোধর্ম্মের নিত্যাস্তিত্ব নাই, তাহা পরিবর্ত্তনশীল। তাহা আত্মধর্ম্মের ন্যায় নিত্যস্থায়ী নহে। মনোধর্ম্মে বিরতি আছে, নিবৃত্তি আছে। কিন্তু আত্মধর্ম্মে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা রতি বা প্রবৃত্তি নিত্য বর্ত্তমান। শুদ্ধ আত্মা কৃষ্ণগৃহব্রত। কৃষ্ণগৃহব্রত না হইলে দেহগেহব্রত হইতেই হইবে। কারণ চেতনার ধর্ম্মই প্রবৃত্তি; সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; সে হয় কৃষ্ণের দিকে, না হয় মায়ার দিকে যাইবেই। চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হইলে, কৃষ্ণই যে আনন্দ, তাহা বুঝা যায়। নিজেকে নিত্যানন্দের বলিয়া জানিতে না পারা পর্য্যন্ত শ্রী নিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীব আমাদের কোন সম্পত্তি নাই।

জড় দেহ-মনের দ্বারা ভোগ হয়। হাড়মাংসের থলের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না। তবে যেকালে আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরিসেবা-ধর্ম্মক্রমে দেহ ও মনও হরিসেবা করিতে বাধ্য হয়। চেতনেই চেতনের সেবা করে। আত্মাই নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমাত্মার সেবা করে। মনের কল্পনার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান থাকা চাই; নতুবা সেবা হইবে না। কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য—এইরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগবাঞ্ছাময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নহে। কৃষ্ণকেই একমাত্র আরাধ্য বলিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারাই আমার একমাত্র বান্ধব, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ নাই—এই বিচার হইলেই মঙ্গল। সেই ভগবৎসেবকগণই বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণবগণের—পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চমতত্ত্ব শ্রীশ্রীবাসাদি বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীউচ্ছিষ্টই আমাদের বরণীয় হউক। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু যেন আমাদের গ্রহণীয় না হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট যে সে বস্তু নয়, তাহা বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাহাতে মায়ার সংস্পর্শ নাই। চঞ্চল মনের দ্বারা চালিত হইলে নিষ্ঠার অভাবে এই পরম উপাদেয় বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে সর্ব্বোত্তম বুদ্ধি হয় না। সুতরাং পঞ্চতত্ত্বাশ্রিত আমরা—গুরুবৈষ্ণবের অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর আমরা কোনপ্রকারে আমাদের চঞ্চল মনকে তত্ত্ববিরোধ করিতে দিব না। নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের পদধূলি বা তাঁহাদের পাদুকাবাহী জানিয়া তাঁহাদের পরম মঙ্গলময় পাদুকাদ্বারা নিজের দুষ্ট মনকে সর্ব্বক্ষণ সংশোধিত করিয়া তাঁহাদের অনুগত হইয়া যদি মনকে দোরস্ত করিতে পারি, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য যদি পাই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ নিষ্কণ্টক হইবে। তখন গুরুবৈষ্ণবের নাম শুনিয়া আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল উঠিবে। তখন সহস্রমুখে তাঁহাদের গুণবর্ণন করিবার জন্য আমাদের চিত্ত উৎসাহান্বিত হইবে।

—০—

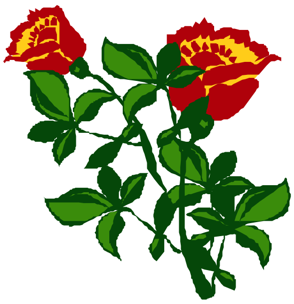

শ্রীল আচার্য্যপাদের শততম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মহোৎসব

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

গোদ্রুম, জুন, ২০০৬

পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণ কমলে নিত্যপ্রণত হয়ে আজ আমরা গুরুবর্গের অন্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের শততম আবির্ভাব তিথি পালনে যে ব্রতী হয়েছি এর মধ্যে আমাদের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে।

ভগবানের আরাধনা আর ভগবানের ভক্তগণের আরাধনার মধ্যে কোনো তফাৎ নাই। যিনি হরি তিনিই গুরু। আবার হরি-গুরু-বৈষ্ণব তত্ত্ব একটা সমান plane-এর কথা। কেন আমরা শতবর্ষ পালনে ব্রতী হয়েছি? তাঁর গুণপনার কথা স্মরণ করবার জন্য এবং তাঁর কৃপালব্ধ যে সব শুদ্ধ আত্মা-শিষ্য-ভক্তগণ এই কয়েকদিন ধরে অনুক্ষণ তাঁদের উপলব্ধ সত্যের কথা বললেন সেটা সকলের কাছেই শিক্ষণীয়। কেমন করে অজ্ঞ অবস্থা থেকে বিজ্ঞ হয়ে ভগবানের পাদপদ্মের দিকে যায় জীব-আকৃষ্ট হয়ে এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রত্যেকের হৃদয়ে তিনি যে দীপ জ্বেলে দিয়ে গেছেন সেটাই জীব চিন্তা করতে থাকে। এরকম মহাপুরুষের শতবর্ষ পালন করা দরকার যাঁর দ্বারা বহুলোকের নিত্যকালের ভূমিকাই হিতসাধিত হয়, —নিত্য-আনন্দময়-রসঘন এবং যেটা দুঃখের অবধি থেকে রক্ষা করে। আমরা সকলে দুঃখের সাগরেই আছি। এই দুঃখ সাগরের picture-টা কি রকম?

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব।
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥"

(ভাঃ ৩।৯।১০)

যাঁর প্রসঙ্গ বিমুখ হলে—যাঁর মানে ভগবানের বা ভগবানের ভক্তের প্রসঙ্গ বিমুখ হলে তাদের এরকম অবস্থা সংসারে গমনাগমন হয়। আবার সেই সমস্ত ভক্তগণের প্রসঙ্গ এবং পরিচর্য্যার দ্বারাই জীবের অনেকদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবনাযুক্ত যে সমস্ত চিন্তাস্রোত এবং চলমান জগতের চিন্তাস্রোতের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক হয়। যে শতবার্ষিকী উৎসব যাজনে আমরা ব্রতী হয়েছি এই শতবার্ষিকী আবার একশত বছরের জন্য আমাদের নবীন আশার সূচনা করবে এবং আমাদের চলার পথে পাথেয় বা সাহায্যকারী হবে। গৌরসুন্দর জগতের ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা থেকে, মোহগ্রস্থ অবস্থা থেকে জীবকে জাগাবার জন্য তাঁর নিজ পরিকরকে পাঠিয়েছিলেন যাতে তাঁর কাছে যাওয়ার সুগম রাস্তা তিনি আবিস্কার করে রেখে যান। গুরুদেব, আমাদের পরম আরাধ্যতম শ্রী শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজ তিনি প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপাধন্য হয়ে যে মূল বৃক্ষরোপন করে গেলেন, সেটা যখন ফলেফুলে বিকশিত হয়ে উঠবে তখন বিশ্বকে আরো শোভান্বিত করবে। তাঁর লীলাবলী, তাঁর আবির্ভাব, তাঁর সেবা প্রচেষ্টা এসবই অত্যদ্ভুত। এনাকে সাধারণভাবে দেখতে গেলে সাধারণ লোকের মতো মনে হলেও তিনি অসাধারণ বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আবির্ভূত ছিলেন। আমরা অনেকদিন তাঁর সঙ্গে থেকেছি বটে কিন্তু আমাদের পাত্রত্ব অনুসারে তাঁর মহিমামন্ডিত রূপটা ধরা পড়েছে। আমাদের পাত্র ক্ষুদ্র হলেও তার দ্বারা ততটাই ধরা পরেছে। পাত্রটা বিশাল বড় হলে সেরকম পাত্রে তাঁর কৃপাটা বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে। —এইভাবে তিনি আমাদের মধ্যেই ছড়িয়েই আছেন। সেজন্য আমরা ধন্য হলাম তাঁর শতবার্ষিকী পর্বটা বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাট আদি দর্শনের মধ্য দিয়ে সারাবছর ধরে পালন করবার সুযোগ পেলাম। বাংলাদেশে তাঁর আবির্ভাব স্থানে গেছি। এখন যদিও সেটা মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে গেছে তথাপি তার শুচিতা এখনও আছে। আবার ভক্তসঙ্গের সমাগম যখন হল তখন সেটা জাগ্রত হল, revitalished হল, স্বচ্ছন্দ্য লাভ করল, তাঁর আত্মীয় স্বজনরাও আমাদের রাস্তায় চলবার জন্য অনুপ্রাণিত হলেন—এই হল আমাদের লাভ। এর পরে পরে যেখানে যেখানে আমরা বিচরণ করলাম তাঁর গুণের কথা, তাঁর কীর্ত্তির কথা অনুকীর্ত্তন করবার সুযোগ নিয়েই ঘুরেছি। তাঁর

কথা এবং তাঁর সিদ্ধান্ত একবার যাঁরা শুনেছেন তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর চরণে আকৃষ্ট হয়ে গেছেন। তিনি কি বলতেন? তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণকে অনুশীলন করবার কথা বলতেন, ভক্তকে অনুগৃহ্ন করবার কথা বলতেন, নামকে অনুশীলন করবার কথা বলতেন। সেগুলো কত প্রাণবন্ত হত তাঁর কাছে আসলে। ভগবান তাঁর ভক্তকে দিয়েই তাঁর মাধুর্য্যটা ছড়িয়ে দেন। ভক্ত যদি না থাকতো ভগবানকে কে জানতো ভগবান বলে? আর ভগবানকে যদি বা জানলো ভগবান বলে কিন্তু তার অনুভবটা কে দেবে? তাঁর অনুভবটা দেবে সাধু দেবে শাস্ত্র। সেজন্য রূপ-সনাতনাদি মহাজন এসে মহাপ্রভুকে জীবের হৃদয়ে অক্ষয়-অব্যয় করবার জন্য কত চেষ্টা না করেছেন। তাঁরা অনুক্ষণ সেই ভাবে বিভাবিত হয়ে, মহাপ্রভুর আদেশকে অক্ষয়-অব্যয় করবার জন্য, আদেশটাকে জীবন মনে করে তাঁরা পালন করে গেছেন। লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধার করবার কথা বলে গেছিলেন মহাপ্রভু, আর নানা শাস্ত্র প্রণয়ণ করতে বলেছিলেন। যে সমস্ত শাস্ত্র, গ্রন্থ লোকলোচন থেকে চলে গেছে সেগুলোকে সংগ্রহ করে তার ভাব ভাষা সুন্দর করে আবার পরিপূর্ণভাবে রূপ দিয়ে এবং বিভিন্ন স্থানে মন্দির আদি নির্মাণ করিয়ে রাধাগোবিন্দের লীলাকে চিরন্তন জীবের ভাগ্যাকাশে প্রকট করে গেছেন। তেমনি পরবর্তী কালের মহাজনগণও সেই ব্রতের ব্রতী হয়ে মহাপ্রভুর সময়কার যে বাচ্যের সেবাবাচকের সেবা—বাচ্য হচ্ছে তাঁর বিগ্রহ আদি, বাচক হচ্ছে তাঁর নাম-গ্রন্থাদি এই দুই সেবার দ্বারা জীবের হৃদয়ের গূঢ়ধন-প্রেমধনকে জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করে গেছেন। Practical teacher শুধু বই লিখে যাননি, কথা বলে যাননি—জীবন দেখিয়ে, ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে, সাধন দেখিয়ে সাধকের জীবনকে অনুপ্রাণীত করে গেছেন। এটা সব থেকে বড় আনন্দের কথা। Practicing teacher না হলে তো ভাগবতের শিক্ষা দিতে পারে না, ভগবানের কথা, ভক্তগণের মনিকোঠায় কথা কেউ বলতেও পারে না, কেউ শুনতেও পারে না,—সেজন্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবেত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥"

এগুলো তো জানার কথা নয়, এগুলো realize করার বিষয়।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরহ যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণম্ ॥"
(ভঃ রঃ সি)

[প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্য লক্ষণ। তর্ক প্রাকৃত, সুতরাং সে তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্যভাব সকলে তর্ক যোজনা করিবে না।]

অচিন্ত্য সত্ত্বাকে কিভাবে হৃদয়ে প্রকট করা যায়? এটা বহুবার শুনলেও হয় না, বহু জনের কাছে বললেও হয় না—"বহু ন শ্রুতেন ..." বহু শ্রুতি সাপেক্ষে হয় না। হয় কখন? না যখন ভগবান নিজে হৃদয়ে স্ফুরণ করাবেন। এইভাবে যখন শরণাগত চিত্ত হয় তখন তাঁর কৃপায় ভক্তগণের দ্বারা Enlighted জাগ্রত করে দিয়ে যান। আরাধ্য তত্ত্বের মধ্যে এই যে মহাজনগণের আরাধনা-শাস্ত্র বলছেন,

"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥"

সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু আরাধনা পরম এবং বিষ্ণুর আরাধনার থেকেও শ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে 'ত্বদীয়ানাং সমর্চনম্' 'ত্বদীয়' শব্দে ভক্তগণের এবং তৎসম্বন্ধীয় আরো যে সমস্ত বস্তুকে বোঝায় তাদের আরাধনা থেকে ভক্তিটা লাভ হয়, আর ভক্তি লাভ না হলে ভগবানকে চেনা যায় না।

'কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি।'

ভক্তির বশ যেখানে চৈতন্য গোসাঞি—সেই ভক্তির ছিটে ফোঁটা যদি লাভ করতে হয় তাহলে গুরু আরাধনার দরকার আছে। আম্নায় ধারায় নেমে এসেছেন যে অতিমর্ত্ত্য গুরুদেব সেই গুরুদেবের আরাধনার দ্বারাই কেবল আমরা ভগবানকে হৃদয়ে আবির্ভূত করাতে পারি। এগুলো খুব সূক্ষ্ম বিচার অতিকায় গূঢ় কথা। যারা সাধন করেন তাদের জীবনে এগুলো point out করে রাখা দরকার। আমরা ভগবান-ভগবান বলে চীৎকার করলেও হবে না। ভগবানের নামাবলী কীর্ত্তন কোথায় না হয়—সর্বস্থানে-হাটে-মাঠে-ঘাটে কতভাবে ভগবানের নাম কীর্ত্তন হয়—কিন্তু এসবের দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে না।

নাম সেব-ই, নাম জপ-ই, নাম-মূর্তিমান

—যে সমস্ত ভক্ত, তাদের অঙ্গের আভাসেই কল্যাণ সাধিত হতে পারে যদি আমরা সৎ সাধক হই, আমরা ভগবানের অনন্যসাধন পথে বিশ্বাসী হই। ভগবানতো কারোর হাতের মুঠোর জিনিস না, ভগবানের নামও প্রাকৃত জীহ্বায় উচ্চারিত হতে পারে না। ভগবানের নামের মধ্যে যদি ভগবানকে দেখার ক্ষমতা থাকে তাহলে সেই নাম উচ্চারণকারী কি রকম powerful মহাজন হওয়া দরকার। অমানী মানদ ধর্মে স্থিত হলে তাদের হৃদয়ে এগুলো অনুভবের বিষয় হয়। আবার তাঁদের হৃদয়ের অনুভূত সত্যটাও ছড়িয়ে দিতে পারেন যদি শিষ্য শুশ্রুষু হয়। সেজন্য সিদ্ধান্ত করে বললেন এই যে ভাগবতের সত্যতা কে উপলব্ধি করবে? কাদের শ্রবণের বিষয় হবে? কখন হবে? এবং কোন ধর্ম বশে হবে?

"প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

—এই তিনটা বৃত্তির একসঙ্গে উদ্গম হলে তবে তার হৃদয়ে সাধুদের কথাটা ধরা পড়ে, এবং সৎগুরুর আশ্রয়ে ভগবৎ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ভগবানের নামে, ভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ হলে তবে বাস্তব বস্তুর সাম্মুখ্য লাভ হয়। বাস্তব বস্তুর পরিচয়টা কি?

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"
[ভাঃ ১।১।২]

এই যে সব কথা আছে ভাগবতে সেগুলো গুরুপাদপদ্মের কৃপাতে আমরা জানতে শিখেছি। তিনি ভাগবত মূর্তিতে ভাগবত কথা সর্বক্ষণ বিতরণ করেছেন। ভাগবত ছিল তাঁর জীবন এবং তিনি জীবন দেখিয়ে ভাগবতের প্রতি আদর দেখিয়েছেন। সব সময় তিনি ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা মুখে আস্বাদন করতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আদর মহাপ্রভু যেরকম দেখিয়েছেন সেরকম ভাবে বৈষ্ণবগণও ভাগবতের আদর দেখিয়েছেন এবং সেই ভাগবতের থেকেই আমাদের সর্বপ্রকার মঙ্গল সম্ভব —

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযুষ সর্ববেদৈকসৎফল।
সর্ব সিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃকৃপ্রদ॥
সর্বভাগবতপ্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো।
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিবর্ত্তিত॥
পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে।
সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে॥
মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদগুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে॥
অসাধু সাধুতাদায়িন্নাতিনীচোচ্চতাকর।
হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্ণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি এইভাবে জগৎ জীবকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের আরাধনার দ্বারা কি লাভ হয়? ভক্ত মূর্তিতে ভগবানের আরাধনা করতে হয়, ভাগবত মূর্তিতে ভাগবতের কথা জানতে হয়। ভাগবত রসে নিঃস্নাত হয়ে সেই ভাগবত মূর্তিতেই আবার ভাগবতের কথা প্রচার করতে হয়। তবেই জগৎ জীবের যত problem আছে সব দূর হয়ে যায়। এসব কথা আমরা শুনছি গুরুমুখ থেকে গুরুপাদপদ্ম নিটোল বস্তু, অক্ষয়-অব্যয় পুরুষ, খল ধর্ম বা জড়ীয় কোনো ধর্মতাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনা। চিরন্তন বাস্তব সত্যের মধ্যে থেকে বাস্তব বস্তুই তিনি দান করেছেন। এই সমস্ত কথা তাঁর কৃপায় আমরা ধীরে ধীরে জানতে শিখেছি। ছোটো, বড় সব ভক্ত তাঁর কাছে এসে আকৃষ্ট হয়েছেন—এটা বড় আশ্চর্য্যের কথা, মহা আনন্দের কথা, যদিও তাঁর শতবর্ষ তিথি পালন আমাদের জীবনে আর আসবে না, কিন্তু এই শতবর্ষ সমারোহকে চির জাগ্রত করে রাখতে পারলে হৃদয়ে হৃদয়ে চলতে থাকবে। স্বতঃ সিদ্ধভাবে স্খালন হতে থাকবে এই রস। এই রস সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি করতে পারে।—এরকম বন্ধু আর কেউ নাই। সেজন্য আমরা যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব পাই সব অনিত্য, আমাদিগকে ঠকিয়ে যায়। কিন্তু গুরুদেব সৎশিষ্যকে কখনো ঠকান না। তাকে সব সময় ভগবৎ পাদপদ্মের সান্নিধ্যে দিয়ে, নিজে সঙ্গ দিয়ে ভক্তিরাজ্যে স্থাপন করে সৎব্যক্তির সম্পন্ন করে তোলেন—এখানেই আচার্য্যপাদের মহান্ ব্যক্তিত্বের পরিচয় ধরা পড়েছে—তার সন্ধান যাঁর পেয়েছেন তাঁরা ভাগ্যবান।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ॥"

—০—

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

অনেক অপস্বার্থপর ভাড়াটিয়া পাঠক তাঁহাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা-ব্যবসায়কে 'দক্ষিণা-গ্রহণ' বাক্যের দ্বারা সমর্থনপূর্ব্বক শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোককে ঠকাইতে চাহেন। ভক্তিযাজনকারীর দক্ষিণার আকাঙ্ক্ষা যে কর্ম্মমার্গীয় বিচার, ইহা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ভাগবতের টীকায় ''কথঞ্চিদ্ধনাদিককামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাৎ'' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা বা কীর্ত্তন আত্মার অহৈতুকী অপ্রতিহতা বৃত্তি, তাহা শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ, উহাতে কর্ম্মীর ন্যায় দক্ষিণা প্রাপ্তির আগ্রহ বা আশা, ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল বিচার ও ভীষণ অপরাধ। যাঁহারা 'দক্ষিণা-গ্রহণ' বাক্যের দ্বারা ভাগবতব্যাখ্যা ব্যবসায়কে সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষ শাস্ত্রদর্শিগণ ''বৈষ্ণবাচার্য্য'' না বলিয়া ''কর্ম্মফল-বাধ্য কর্ম্মী'' মাত্র বলিবেন। ভক্তিতে দক্ষিণামার্গীয় কর্ম্ম-রাজ্যের কোন কথা প্রবিষ্ট হইলে সেখান হইতে অকিঞ্চনা ভক্তিদেবী তিরোহিতা হইলেন। ভাগবত পারায়ণাদির ছলনায় দক্ষিণা-গ্রহণও কর্ম্ম-রাজ্যের ব্যাপার, সেখানে ভক্তির লেশ নাই। রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রাকৃত দ্রবিণ দক্ষিণা দিবেন এবং সেই দক্ষিণা-দত্ত অর্থ ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদির বা নিজ ভোগ্য দেহের সেবায় নিযুক্ত করিব, এই প্রত্যাশায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ অপেক্ষা করেন নাই। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামী প্রভুকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়াছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুও সেই সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তিনি মাঝ-পথে বাটপার হন নাই। পরীক্ষিতের ন্যায় কৃষ্ণের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণই—দক্ষিণা, ভোগীর ভোগ্য হওয়া, ভোগীর ভোগ সংগ্রহ করার নাম দক্ষিণা নহে।

শিক্ষণীয় বিষয়—

''ন ব্যাখামুপযুঞ্জীত'' (ভাঃ ৭।১৩।৮)

''কথঞ্চিদ্ধনাদিককামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নদ্বিনা''

(ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা)

কথঞ্চিৎ ধনাদি কামনা বশতঃ যদি কর্ম্মী বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলেই সেই শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে অর্থাৎ অন্যাভিলাষী কর্ম্মীর ফল-ভোগের ব্যাঘাত হইলেই তাহার কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়।

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥

(চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১)

বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।

(চৈঃ চঃ অ ১৩।১১৩)

মুঞিঃ, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১শ অঃ)

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তা'রাও না জানে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।৬৭, ৬৮)

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

(ভাঃ ৭।৯।৪৬)

দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা—যেখানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের 'জাঙ্গাল' (সেতু) ছিল, সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত নামে জনৈক বিপ্র বাস করিতেন। দেবানন্দ তদানীন্তন পণ্ডিত-সমাজে ভাগবতের একজন মহা অধ্যাপক, কথক ও ব্যাখ্যাতারূপে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, অপরদিকে তেমনি তিনি 'পরম সুশান্ত', 'জ্ঞানবান', 'তপস্বী', 'আজন্ম উদাসীন' এবং 'মোক্ষা-ভিলাষী' ছিলেন। 'আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর' পণ্ডিত দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য মহাভাগবতবর শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত

হইলেন। মহাভাগবত পণ্ডিত শ্রীবাস স্বভাবতঃই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রীতিবিশিষ্ট। মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকারীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহারই দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর যে উপদেশ—''যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে,'' সেই উপদেশ মহাভাগবত শিরোমণি শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রযোজ্য নহে। কারণ মহাভাগবতের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-দর্শন। মহাপ্রভুর লীলাদর্শের ন্যায় মহাভাগবতের শব্দমাত্রেই—ভগবন্নাম-দর্শন, নদীমাত্রেই—কালিন্দী-দর্শন, পর্ব্বত মাত্রেই—কৃষ্ণকামকেলিক্ষেত্র গোবর্দ্ধন-দর্শন; দ্বিতীয়তঃ মহাভাগবতের কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারীর ন্যায় দুঃসঙ্গস্পর্শে পতনাশঙ্কার অবকাশ নাই, বরং মহাভাগবতের সংস্পর্শে বৈষ্ণবাপরাধশূন্য অসৎব্যক্তিরও মঙ্গল সম্ভাবনা। তাই মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানবিদ্ধ দেবানন্দ পণ্ডিতের মুখে (বাহ্যদর্শনে) শ্রীমদ্ভাগবতের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়াও মহাভাগবত পণ্ডিত শ্রীবাসের অকৃত্রিম শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। কিন্তু জ্ঞানবিদ্ধ মোক্ষাভিলাষী দেবানন্দ পণ্ডিত এবং তদন্তেবাসী পড়ুয়াগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে যুক্তি করিয়া মহাভাগবত পণ্ডিত শ্রীবাসের ঐ অকৃত্রিম শুদ্ধ ভাব-বিকারকে তাহাদের গুরু দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার বিঘ্নকারক বুঝিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে সেই স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পাপিষ্ঠ পড়ুয়াগণের ঐরূপ আচরণে দেবানন্দ পণ্ডিত কোন প্রকার বাধা প্রদান করিলেন না। এদিকে পণ্ডিত শ্রীবাস কিছুকাল পরে বাহ্যদশ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে নিজ-গৃহ শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অন্তর্য্যামী বিশ্বম্ভর নিজ শুদ্ধভক্তশিরোমণি পণ্ডিত শ্রীবাসের প্রতি মোক্ষাভিলাষী, পণ্ডিতাভিমানী দেবানন্দ ও তচ্ছিষ্যগণের ঐ প্রকার অশিষ্টাচার স্মরণ করিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ এবং তদুপলক্ষে নিখিল জগৎকে শিক্ষা প্রদানের জন্য একদিন মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালের নিকট কতিপয় ভক্তসঙ্গে পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত দেবানন্দ সেই সময় ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু দেবানন্দের ব্যাখ্যার অভিনব দর্শন ও শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—''এ বেটা ভাগবতের কি ব্যাখ্যা করিতেছে? কোন জন্মেও এই পাষণ্ডের ভাগবতের অর্থে প্রবেশ নাই। ভাগবতে ইহার কোন অধিকার নাই। কারণ এ বেটা অত্যন্ত প্রাকৃত, আর ভাগবত গ্রন্থরূপে কৃষ্ণ-অবতার। সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি ভক্তিই ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। চারি বেদ ভাগবতকে প্রেমময় বস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদ-চতুষ্টয়—দধি-স্বরূপ এবং ভাগবত সেই দধি হইতে উত্থিত নবনীত-তুল্য। আমার প্রিয় শুকদেব সেই বেদ-দধিকে মন্থন করিয়া পরীক্ষিৎকে ভাগবত-নবনীত আস্বাদন করাইয়াছেন। আমি, আমার দাস ও ভাগবতগ্রন্থে যাহার ভেদ বুদ্ধি আছে, সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। যে গ্রন্থভাগবতকে মুখে মানিয়া ভক্তভাগবতকে উল্লঙ্ঘন করে, সে ভাগবতের কিছুই জানে না। ইহার কল্পিত ভাগবত-ব্যাখ্যার কোনই মূল্য নাই জানাইবার জন্য আমি এখনই ইহার পুঁথি ছিড়িয়া ফেলিব।'' এই বলিয়া ক্রোধাবেশে মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের পুঁথি ছিড়িয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন সকল বৈষ্ণব মিলিয়া কোন প্রকারে মহাপ্রভুকে ধরিয়া রাখিলেন। ❑

ব্রতোৎসব তালিকা

১২ ত্রিবিক্রম, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন মঙ্গলবার কৃষ্ণ-একাদশী অপরা একাদশীর ব্রতোপবাস পরদিন পূর্বাহ্ন ৯।২০ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।

২৫ ত্রিবিক্রম, ৬ই আষাঢ় ২১শে জুন, ২০১০ সোমবার গৌরদশমী শ্রী শ্রী গঙ্গাদশহরা শ্রী শ্রীগঙ্গাপূজা। শ্রী গঙ্গাদেবীর ভূতলে অবতরণ তিথি। শ্রী গঙ্গামাতা গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব। দক্ষিণায়ণ দিবসারম্ভ।

২৬ ত্রিবিক্রম, ৭ই আষাঢ় ২২শে জুন, ২০১০ মঙ্গলবার গৌর একাদশী। দি ৯।৫৬ গতে অম্বুবাচী প্রবৃত্তি। পাণ্ডবা বা নির্জ্জলা একাদশীর ব্রতোপবাস। পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ৯।২৩ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।

২৮ ত্রিবিক্রম, ৯ই আষাঢ় ২৪শে জুন, বৃহস্পতিবার গৌর ত্রয়োদশী। শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদের দণ্ডমহোৎসব।

২৯ ত্রিবিক্রম, ১০ই আষাঢ় ২৫শে জুন, শুক্রবার গৌর চতুর্দ্দশী রা ৮। ৭ গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি।

৩০ ত্রিবিক্রম, ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন শনিবার পূর্ণিমা। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব। ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের ১০৪ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রী গুরুপূজা মহোৎসব। শ্রীধাম পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মহোৎসব আরম্ভ। চন্দ্রগ্রহণ (খণ্ডগ্রাস) ভারতবর্ষে দৃশ্য। গ্রহণস্পর্শ দি অপঃ ৩।৪৭ গ্রহণ মোক্ষ সন্ধ্যা ৬।৩০।

১ বামন ১০ই আষাঢ় ২৭শে জুন, রবিবার। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের অনবসর কালারম্ভ। আলালনাথ শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মহোৎসবারম্ভ।

১২ বামন ২৩শে আষাঢ় ৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ একাদশী যোগিনী একাদশীর ব্রতোপবাস। পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ৮।২৪ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।

শ্রীস্নানযাত্রা

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-জগদীশের স্নানযাত্রা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা দেবী স্নানবেদীতে 'পহান্তি'-বিজয় করেন। রত্নবেদীতে সুদর্শন-সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ শীতলসলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর ভগবান্ রত্নবেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন।

যেস্থানে নীলাম্বুধির কল্লোলমালা অবিশ্রান্ত ''জয়জগদীশ'' বলিয়া উদ্গান গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, যেস্থানে নব নব তৃণরাজির হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত, যেস্থান দক্ষিণানিলসংস্পর্শে সুশীতল, যেস্থান বিচিত্র তরুরাজির শোভায় বিভূষিত, সেইরূপ সুপরিষ্কৃত প্রদেশে শ্রীজগদীশের স্নানপীঠ রচিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি, সমুদয় দেবতা জগদীশকে মহাস্নান করাইবার জন্য পরিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূত সলিল শিরে বহন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে মঞ্চস্থ ভগবানকে স্নাত ও 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদ দ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজিত হইয়া ভগবানের শ্রীস্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রা-কালে মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানবেদীর পারিপার্শ্বিক স্নানসমূহ চন্দ্রাতপশোভিত ও মহামরকত-মণিখচিত সুবিস্তৃত আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নানবেদী জীর্ণ হইয়া যাইবার পর মহারাজ অনঙ্গভীম বর্ত্তমান স্নানবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

শ্রীস্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীজগদীশের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাল্য, চামর, পতাকা ও তোরণাদির দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ ও সুশীতল পবিত্র জলদ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপগন্ধ দ্বারা সুরভিত করা হয়। তৎপরে জগদীশের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন পূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী' মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণ কলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলি দান পূর্ব্বক শ্রীজগদীশকে বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদারপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ভগবানের পহান্তিকালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগদীশের স্নানবেদীতে গমনকালে যখন রত্নখচিত ছত্র-নিচয় উত্তোলিত, কালাগুরু-গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপ-মালিকার আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়, যখন শ্রীজগদীশের চতুর্দ্দিকে চামর ব্যজন ও মধুর নৃত্যগীতাদি হইতে থাকে, সেই সময় কোন্ সেবোন্মুখের না মানস-মহোৎসব সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? শ্রীজগদীশকে যিনি বিশুদ্ধ চিত্তের রত্নবেদীতে নিত্যস্নান করাইতে পারেন, তিনিই বসুদেব। সেই বসুদেবের রত্নবেদীতে নিত্য স্নানযাত্রা-মহোৎসব হয়। যাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত অর্থাৎ বসুদেবগণের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান।

শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে বিজয় করাইবার কালে, অনবধানতাপ্রযুক্ত পাছে কোন প্রকার দোষ ঘটে,—এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীপতির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যান। তৎকালে অখিল-জগৎ পূজনীয় শ্রীজগদীশকে দূরগমন-নিমিত্ত উত্তানাস্য করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন, ''শ্রীজগদীশ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন''—এই বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীপতির দিকে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক ''হে রাম, হে কৃষ্ণ, আপনাদিগের জয় হউক! জয় হউক!'' বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলা সহকারে ভগবানের জন্ম-জ্যৈষ্ঠীতে রত্নবেদীতে বিজয় অভিষেক হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীজগদীশ বলিয়াছেন, স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি

চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞপ্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐদিবসই শ্রীজগদীশের পূণ্য জন্মদিন। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐদিবস জগদীশকে অধিবাস পুরঃসর মহাস্নান বিধানানুসারে মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর তাঁহার স্নান বো অনুষ্ঠিত হয়।

মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এইরূপ বিধানে জগদীশজন্মতিথি জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমায় স্নানযাত্রা-মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন, সিন্ধুকূলে যে অক্ষয় বট আছে, তাহারই উত্তরে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকারাশির দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশে যথাবিধানে বলি প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ, কাহাল, মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সেই সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে পূত জল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-সেবা করিতে হইবে। মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের এই আদেশানুসরণে আজিও শ্রীপুরুষোত্তমে এইরূপভাবে শ্রীস্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্নানযাত্রা-মহোৎসবের ফলশ্রুতি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। ফলশ্রুতি পাঠকালে আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা শ্রীজগদীশের স্নানযাত্রা নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না। ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীভগবানের জ্যৈষ্ঠ-স্নান সন্দর্শন করিলে জীবগণকে কখনই ভবসাগরের বিষবারিতে অবগাহন-স্নান করিতে হয় না। যাঁহারা সেবোন্মুখচিত্তে স্নানযাত্রা দর্শন করেন, যাঁহারা হৃদয়-স্নানমঞ্চে শ্রীজগদীশের স্নান সেবা করান, তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত। মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল যে, এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস আমাকে অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না;—

"ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রমবিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন ॥"

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের পট বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে **"অনবসর কাল"** বলা হয়। এই অনবসরকালে বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআলালনাথ দর্শনার্থ গমন করেন। **শ্রীআলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে** এই সময় **সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব** অনুষ্ঠিত হয়, এবং শ্রীপুরুষোত্তমদেবের স্নানযাত্রা ও তদুপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে কীর্ত্তন মহামহোৎসব ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীস্নানযাত্রা দর্শনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন হইতে শ্রীআলালনাথ-ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে উৎসব আরম্ভ হয়। ❑

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

আর একটি পূর্ব্বপক্ষ

এখানে একশ্রেণীর লোক আসিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিতে পারেন,—"মানিলাম যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ মোটরযান, বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দান-সমূহ ব্যবহার করিয়া হরিভক্তিপ্রচারকে বহুলোকের নিকট সুলভ করিয়া দিতেছেন, অতি অল্প সময়ে অত্যধিক লোকের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথাগুলি পৌছাইতে পারিতেছেন; কিন্তু

শ্রীচৈতন্যদেব ত' মোটরযান ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্রও চালান নাই, সাময়িক পত্রিকাও প্রচার করেন নাই, তবে তাঁহার কথা কিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াছে? সুতরাং মোটরযান প্রভৃতি প্রচার-সুলভতার কারণ হইতে পারে না।''

সমাধান ঃ— কথাগুলিতে খুব সমবেদনা-আকর্ষক আপাতযুক্তির বহর আছে, মানিলাম। আচ্ছা, আরও একটু সহিষ্ণুতার সহিত অগ্রসর হইয়া দেখি, প্রত্যেক যুগই একটা অনুপাত (proportion) ও আদর্শের (standard-এর) মান-দণ্ড লইয়া যুগ রচনা করে। সেই সেই অনুপাত (proportion) ও আদর্শের (standard-এর) সহিত যাহারা সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে না, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। মনে করুন, ব্রহ্মালোকে যেখানে ব্রহ্মার পরমায়ু ব্রহ্মপরিমিত শত-বৎসর অর্থাৎ মানবপরিমিত ৩১১০৪০০০০০০০০০০০ বৎসর, সেখানে যদি কোনও শতায়ু মানব ব্রহ্মার অন্তেবাসী হইয়া ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হন, তবে ঐ মানবের দ্বারা ব্রহ্মার সেবা হইতে পারে কি? মানবপরিমিত শতবৎসর পরমায়ু ব্রহ্মার পরিমিত শতবৎসর পরমায়ুর নিকট নিমেষকালও নহে। ব্রহ্মার সেবা করিতে হইলে ঐ মানবের ও ব্রহ্মার সমকক্ষ পরমায়ু* বা ব্রহ্মালোকের উপযোগী পরমায়ু-বিশিষ্ট হইতে হইবে, নতুবা সেবা হইবে না। কলিযুগের পরিমিত পরমায়ু বা শারীরিক গঠন, উপকরণ প্রভৃতি দ্বারা সত্যযুগের পরিমিত পরমায়ু বা আকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সেবা হয় না। কলিযুগের পরিমিত হস্তের সাড়ে-তিনহস্ত মনুষ্য সত্যযুগের পরিমিত হস্তের সাড়ে তিনহস্ত মনুষ্যের অঙ্গ সেবা করিতে পারে না। মনে করুন, কোন এক দস্যুর দল বহু অর্থ লুণ্ঠন-পূর্ব্বক মোটরযানারোহণে পলাইতেছে, ঐ দস্যুদলকে ধরিতে হইলে শাসক-সম্প্রদায়কে যদি পদব্রজে হাঁটিয়া বা দৌড়াইয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে দস্যুদল ধরা পড়িবে না; দস্যু-সম্প্রদায়কে ধরিতে হইলে শাসক-সম্প্রদায়ের তদপেক্ষা অধিকতর দ্রুততর যান আবশ্যক। কিন্তু দস্যু-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই শাসক-সম্প্রদায়কে হাঁটিয়া যাইবার অর্থাৎ তাহাদের সমকক্ষ বা তাহাদের অপেক্ষা অধিক গতিবিশিষ্ট উপকরণ হইতে বঞ্চিত থাকিবার পরামর্শই দিবে। কারণ, তাহা হইলে তাহারা বেশ সুবিধা মত নির্ব্বিবাধে পলাইতে পারিবে! আমাদেরও অবস্থা তাহাই হইয়াছে; আমরা কৃষ্ণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া পলাইতেছি, শ্রীগৌড়ীয়মঠ যাহাতে আমাদিগকে না ধরিতে পারেন, তজ্জন্যই আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানার্থ আমরা উপদেশকের সজ্জায় গৌড়ীয়মঠকে তাঁহাদের হরিসেবার সর্ব্ব অনুকূল উপকরণ হইতে বঞ্চিত করিবার দুরভিসন্ধি পোষণ করি! কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ন্যায় ক্রূর ও কপট-চরিত্র দস্যুগণকে ধরিবার এত বেশী প্রয়োজন পড়িয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী উপকরণ-সমূহের দ্বারা আমাদের অন্তিম মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল কথা যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এবং বুঝিয়া আনন্দ-লাভ করিবেন, তাঁহারাই 'ভক্তি' বা 'সেবা'-শব্দের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

যে যুগে বিজ্ঞান মোটর, বৈদ্যুতিক যান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়াছে, সেই যুগে যদি কেহ সেকেলে নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠার্জ্জনের জন্য একদিনের পথ একমাসে যান, টেলিগ্রাফ ব্যবহার না করিয়া ২ বৎসর হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়া হরিসেবার সেই কার্য্যটি করেন, তাহা হইলে তাহা বোকামী ও হরিসেবার প্রতি ঔদাসীন্যই প্রমাণিত করিবে না কি? যে যুগে যে-পরিমাণ দ্রুতগতিতে কার্য্য হইতেছে, সেই যুগে তদনুপাত দ্রুতগতিতে চলিয়া যদি কার্য্য না করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে হরিসেবার কার্য্যেও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। মনে করুন, কোন মুমূর্ষু হরিকথা-পিপাসু ব্যক্তি কাশ্মীর হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকের নিকট ভাগবত-কথা শুনিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক লোক প্রেরণ করিলেন; সেই লোকটির হাঁটাপথে কলিকাতা পৌঁছিতে ৩।৪ মাস

** সত্য, ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি—এই চতুর্যুগকে দিব্যযুগ বলে। মানবমানে তাহা ৪৩২০০০ সৌরবর্ষ। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। উহাই ব্রহ্মার একদিন। কল্পান্তে যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলে; ব্রহ্মারাত্র ঐ পরিমাণ। এইরূপ ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মার একমাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর এবং পঞ্চাশৎ বর্ষে এক পরার্দ্ধ। এইরূপ দ্বি-পরার্দ্ধকাল ব্রহ্মার পরমায়ু।*

কাটিয়া গেল, (কারণ, তাঁহার মতে হরিসেবা-কার্য্যে টেলিগ্রাফ বা রেলগাড়ী ব্যবহার করিবার উপায় নাই—পঞ্চায়েতের মতে ঐগুলি কেবল মানবের ভোগের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইবে) আর শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া,
—নদী-নালা সাঁতরাইয়া—রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া ৩।৪ মাসের পর গিয়া কাশ্মীরে পৌঁছিলেন; এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহুপূর্ব্বেই মুমূর্ষু শুশ্রূষু ব্যক্তি ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক কেবল জগতের বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া তাহাদের নিকট 'বাহাবা' কুড়াইবার জন্য যদি তাহাদের ঐরূপ পরামর্শ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কি লাভ হইবে? ব্যক্তিগত ভজন ও প্রচার-কার্য্যের সহিত ভুল করায় ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সমাজের এইরূপ শত শত ভ্রমোৎপত্তি হইতেছে।

—০—

আশয় ও আশ্রয়

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

(সেবাসচীব, গৌড়ীয় মিশন)

সকল জীবের পরম আশ্রয় হলেন ভগবান্। তাঁকে ভুলে আজ আমরা দুঃখী। এই দুঃখের চির-অবসান ঘটানোর জন্য শাস্ত্রে ভগবৎ ভজনের নির্দেশ। আর ভগবৎ ভজনের অনুরোধে গুরু পদাশ্রয় এক অপরিহার্য অঙ্গ। আদৌ "গুরু পদাশ্রয় তস্মাৎ কৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণম্"—শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের ভাষায় সর্ব্বাগ্রে এর প্রয়োজনীয়তা। এর পূর্বে ভক্তি সাধন শুরু হয় না।

গুরু পদাশ্রয় বলতে আমরা সাধারণতঃ গুরু ধারণ বা গুরু স্বীকার করা বুঝি। গুরুর কাছে গিয়ে মন্ত্র গ্রহণ করলেই ঐ কার্য্য পূর্ণ হয় বলে মনে করি। কিন্তু গুরু ধারণ ব্যাপারটা খুব সহজ নয় এবং স্বল্প ভাগ্যে যে কোন জীব তা পেতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের মতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে গুরু দুই প্রকার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গুরু পদাশ্রয়ই দেখা যায়। পিতা-মাতা থেকে শুরু করে গুরুজন, দ্বি-জাতি সংস্কার দাতা ব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত কুলগুরু আদি সকলেই ব্যবহারিক গুরু। আর পরমার্থ পথে জীবকে আকর্ষণ করে ভববন্ধন ছিন্ন করা, ঈশ্বর ভক্তির চরম ফল প্রেম পর্যন্ত দানে সমর্থ মহান্ত গুরুই পারমার্থিক গুরু। পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার গুরু হ'তে ইনি শ্রেষ্ঠ।

এঁরা প্রকৃত আশ্রয় দাতা গুরু। ভবে ভ্রমণরত ত্রিতাপ ক্লিষ্ট জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে আকর্ষণ করে হরিসেবায় নিযুক্ত করেন এরা। পরমার্থ পথের পথিক এঁদের পরম সুশীতল শ্রীচরণ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে নিত্যশান্তি লাভ করেন। এইরূপ গুরুর দর্শন, তাঁর নিকট শরণাগত হয়ে মন্ত্র ও শিক্ষাদি গ্রহণই প্রকৃত গুর্ব্বাশ্রয়। এরূপ গুরুর দর্শন দুর্লভ। পূর্ব জন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে এঁদের দর্শন বা কৃপালাভ হয়। পরমার্থ লাভের আশায় অতিসুকৃতিবান জীব এঁদের চরণ আশ্রয় করেন। এঁরা মন্ত্র দাতা, আশ্রয় দাতা ও সেবা দাতা। এঁদের সঙ্গ ধরে ভগবৎ সেবার চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হয় জীব। তাই সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক গুরু ত্যাগেও কোন দোষ হয় না। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ বলেন—"পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ"—(ভঃ সন্দর্ভ)। পরমার্থিক গুরু পদাশ্রয়ই প্রকৃত আশ্রয়।

'আশ্রয়'-শব্দটিও খুব হাল্কা অর্থবোধক নয়। পারমার্থিক জগতে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। আশ্রয় অর্থে শরণ গ্রহণ বা পূর্ণ শরণাগতি। কায়-মন-বাক্যে গুরুদেবের হয়ে যাওয়া, তাঁর চরণে নিজকে বিকিয়ে দেওয়া। জাগতিক ভোগময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে অন্য এক ভজনময় জীবনের সূত্রপাত করে এই পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয়। এবং এই আশ্রয় পরিপক্ক দশায় এরূপ অবস্থা লাভ করে যে জগতের পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধুর সম্বন্ধ হাল্কা বা তুচ্ছ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে

পারমার্থিক রাজ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নিত্যকালের এবং রক্তের সম্বন্ধ হতে বহু গুণ দৃঢ়তা লাভ করে। পরমার্থ পথের এই গুর্ব্বাশ্রয় গুরুশিষ্যের প্রগাঢ় প্রেম বন্ধনময় আশ্রয়। জাগতিক আশ্রয় বিষয়ক কোন হেয়তার অবকাশ নেই এখানে। নিশ্চিতরূপে এইরূপ গুর্ব্বাশ্রয় জবের জীবনে মহাভাগ্যের সূচনা।

পাঠকগণের মধ্যে আমরা অধিকাংশই ঐরূপ পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া শেষ করেছি। কিন্তু এটা ঠিক আশ্রয় নয়। আশ্রয়ের সূচনা বা আভাস মাত্র। পারমার্থিক ব্যাপারটা সূক্ষ্ম, এর বিচারধারাও সূক্ষ্ম। এখানে সব কিছু তাত্ত্বিক। ভগবান্ নিত্য তত্ত্ব, তাঁর ভজন বিষয়টিও সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক। ভজন রাজ্যে জাগতিক সকল বস্তু অস্থায়ী, বিকৃত এবং অতাত্ত্বিক। ভজন রাজ্যে আশ্রয় ব্যাপারটি তাত্ত্বিক। জাগতিক ভাব বা সম্বন্ধযুক্ত নয়। ভগবান সর্বশক্তিমান তত্ত্ব, গুরুদেব সেবক ভগবান্, আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগবৎ অংশ। ভগবৎ বিস্মৃতি বশতঃ মায়িক সংসারে এসে অতাত্ত্বিক বস্তুর সম্বন্ধে নিজেদের আবদ্ধ করেছি। এখন ভগবৎ সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ দ্বারা নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য গুরুপদাশ্রয় করেছি। এইরূপ বোধ না আসা পর্য্যন্ত আশ্রয় ব্যাপারটা শুদ্ধ হয় না। এই বোধ মনে প্রাণে ও আত্মায় ব্যপ্ত হওয়া চাই। তবেই সেটা পারমার্থিক আশ্রয়। এই গুর্ব্বাশ্রয় জীবের জীবনে নুতন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই আশ্রয় শ্রীহরি চরণাশ্রয়েরই ভিন্ন রূপ বা প্রাথমিক সোপান। এর দ্বারাই পারমার্থিক জীবনে প্রবেশ লাভ, কৃষ্ণদাসত্ব লাভের সূচনা তথা গোলকের পথে যাত্রার শুভারম্ভ ঘোষিত হয়। মায়ার দাসত্বের পালা এখান থেকেই স্তব্ধ হয়। আমি তখন আমার নয়, আমি কৃষ্ণের—এই ভাব জাগ্রত হয়। আশ্রয় শুদ্ধ হলেই সেবকের সেবা শুরু। সেবার সঙ্গে সঙ্গে শরণাগতির পরিপক্কতা লাভ হয়। তখন সেবক কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণে যোগ্যতা লাভ করে। কৃষ্ণ তাকে নিজের বলে অভিমান করেন এবং সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

"আশ্রয় লৈয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।"

আশ্রয় গ্রহণের শুদ্ধতা বা পূর্ণতা আর একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটি হলো 'আশয় বোধ'। 'আশয়'—শব্দে হৃদয়ের ভাব বা ইচ্ছা। এই ভাব একটি বিরাট জিনিস এবং এই ভাব বোধ ভক্তি রাজ্যের একটি সূক্ষ্ম কথা। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ করে বলেছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো ন অভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্ট অন্তস্তু অনয়ো তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"-২/১৬

এ জগতের ক্ষণভঙ্গুর বস্তু দেহ-গেহ-কলত্রাদিতে কোন ভাব, আনন্দ বা প্রেম সম্বন্ধ নেই আর নিত্য তত্ব ভগবৎ বস্তু সকলের কোন অভাব নেই, অপ্রীতি বা নিরানন্দ নেই। এটা সাধককে সাধনের শুরুতেই বুঝতে হবে। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়। আমি তাঁর অংশ, তাঁর দাস। তাঁর সঙ্গে নিত্য প্রেম সম্বন্ধ রয়েছে আমার। পথ ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমি। এখন গুরুদেবের কৃপায় তাঁর মধ্যস্থতায় ঘরে ফিরে এসেছি। কৃষ্ণের কাছে এসেছি। প্রিয়জনকে কাছে পেলে কার না আনন্দ হয়? তিনি ভালবাসেন এবং আমার ভালবাসা তিনি চান, অপেক্ষা করেন। তাঁর সুখবিধানময়ী সেবা করাই আমার কর্ত্তব্য—এই সব ভাব বা আশয় বুঝে আশ্রয় গ্রহণ করলে আর কথাই নাই, সোনায় সোহাগা। সাধকের সাধনে সিদ্ধি লাভের এটাই মূল মন্ত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় থেকে সাধকের সাধন শুরু। গুরুদেবের ভাব বা আশয় সাধককে বুঝতে হবে। তাঁর কাজ কি? ইচ্ছা কি? হৃদয়ের ভাব কি?—এর অনুধাবন করতে হবে। তিনি কি জন্য মঠ মন্দির করেন, শিষ্য করেন, এতে তাঁর কি স্বার্থ আছে? কৃষ্ণ সেবার একটা জাল বিস্তার করে চতুরতা পূর্বক এক একটি সুকৃতিবান জীবকে ধরে সেবা শিক্ষার দ্বারা তাকে সুদক্ষ সেবক তৈরী করে কৃষ্ণলোকে পাঠাতে চান তিনি। এই সেবার অনুরোধে যাবতীয় অন্বয় ও ব্যতিরেক চেষ্টা তাঁর। আমি তাঁর বঞ্চনাময় বাহ্য চেষ্টা সমূহের ফাঁদে না পড়ে তাঁর আশয় বা অন্তরের ইচ্ছা বুঝে চলবার প্রযত্নশীল হব—এটাই সাধকের কাজ। তিনি কৃষ্ণের পরম প্রিয় সেবক আর আমি কৃষ্ণসেবা পেতে চাই—এই ভাবের অনুকূলে যা কিছু সব গ্রহণ করবো এবং এর প্রতিকূল ভাব সর্বথা বর্জন করবো—তার নাম আশ্রয়। তার নাম শরণাগতি এবং তার নামই ভক্তি। ❑

শ্রীঃ ভঃ পঃ/৪৭বর্ষ/জুন/১১শ/২০১০

আনন্দ সংবাদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০ বর্ষ পূর্তি সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার স্মরণে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক শ্রীঊর্জ্জাব্রতকালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা আদিসহ সমস্ত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও দিল্লীতে বিশাল আন্তর্জাতিক অধিবেশন

শ্রদ্ধালু ভক্তগণ,

এই বৎসর কার্ত্তিক মাসে ঊর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের আনুগত্যে গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে আগামী ৪ই নভেম্বর, ২০১০ (১৮ই কার্ত্তিক, ১৪১৭) হইতে ২৩শে নভেম্বর, ২০১০ (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪১৭) পর্য্যন্ত প্রায় ২০ দিন ব্যাপী উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থাদি (গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী) ও ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন, পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ, আপনারা দামোদর মাসে শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন সহযোগে উত্তর ভারত ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করুন।

বর্ত্তমান বাস ভাড়া, বাড়ী ভাড়া ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মিশনের পরিচালক মণ্ডলী সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব কম খরচে সম্পূর্ণ পরিক্রমার জন্য ৮, ১০০/- (আট হাজার একশত) টাকা প্রত্যেক যাত্রী পিছু ধার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা শুধু বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ডে থাকিয়া ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া দিল্লীতে সেমিনারে অংশগ্রহণ করিতে চান তাঁহাদিগের জন্য ৫, ১০০/- (পাঁচ হাজার একশত) টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিজ নিজ খরচায় বৃন্দাবনে পৌঁছিতে হইবে এবং পরিক্রমা অন্তে নিজ খরচায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। যাঁহারা কোলকাতা হইতে মিশন কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিক্রমায় যোগদান করিতে চান তাঁহাদিগকে ৮, ১০০/- (আট হাজার একশত) টাকা দিতে হইবে। নিজ নিজ স্থান হইতে ৩রা নভেম্বর অবশ্যই বাগবাজার স্থিত কলকাতা মঠে পৌঁছাইবেন। যাঁহারা যত শীঘ্র আসন সংরক্ষণ করিবেন, তাঁহারা সেই ক্রম অনুযায়ী বাসে Seat পাইবেন।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিঙ্করাভাস
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

—ঃ পরিক্রমা সূচী ঃ—

৪ই	নভেম্বর,	বৃহস্পতিবার	কোলকাতা হইতে সকাল ৫টায় বাসযোগে গয়া যাত্রা।
৫ই	’’	শুক্রবার	গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়বট, ফল্গুনদীতে স্নানাদি ও বুদ্ধগয়া দর্শন।
৬ই	’’	শনিবার	গয়া হইতে মোগলসরাই হইয়া কাশী যাত্রা ও অন্নকূট মহোৎসব।
৭ই	’’	রবিবার	কাশীতে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, আদিকেশব, বিন্দুমাধব, চৈতন্যবট, দশাশ্বমেধঘাট ও হরিশ্চন্দ্রঘাট আদি দর্শন ও রাত্রিবাস।
৮ই	’’	সোমবার	কাশী হইতে অযোধ্যা দর্শন, সরযূনদীতে স্নান, রামজন্মভূমি, হনুমানগড়ী, কনকভবন আদি দর্শনান্তে লক্ষ্ণৌ মঠে গমন।
৯ই	’’	মঙ্গলবার	লক্ষ্ণৌতে শ্রীজগন্নাথ মন্দির, নিত্যানন্দাভিন্ন লক্ষ্মণের রাজ্য ও বিভিন্ন স্থান দর্শন।
১০ই	’’	বুধবার	লক্ষ্ণৌ হইতে বৃন্দাবন যাত্রা।
১১ই	’’	বৃহস্পতিবার	শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের সমাধি, শ্রীমদনমোহন জীউ, শ্রীরাধাগোবিন্দদেব, শ্রীরাধাগোপীনাথ, শ্রীরাধারমণ আদি দর্শন।
১২ই	’’	শুক্রবার	মথুরা—কংসকারাগার, ভূতেশ্বর শিব, আদিকেশব, আদিবরাহ, দীর্ঘবিষ্ণু, বিশ্রামঘাট, আদি দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।
১৩ই	’’	শনিবার	দাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যমলার্জ্জুন মুক্তিস্থলী, মহাবন, লৌহবন, র‍্যাভেল আদি দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।
১৪ই	’’	রবিবার	মান সরোবর, বেলবন, মাঠবন, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, নন্দঘাট, চিরঘাট আদি দর্শন।
১৫ই	’’	সোমবার	পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা।
১৬ই	’’	মঙ্গলবার	বর্ষাণা, বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম, নন্দীশ্বর, প্রেমসরোবর, সঙ্কেত, যাবট, পাবন সরোবর আদি দর্শন ও রাত্রে শ্রী রাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠে বাস।
১৭ই	’’	বুধবার	উত্থান একাদশীর ব্রতোপবাস—গোবর্ধন পরিক্রমা ও রাধাকুণ্ড স্নানাদি।
১৮ই	’’	বৃহস্পতিবার	প্রাতেঃ দিল্লী যাত্রা ও তথায় বিকালে সেমিনারে উদ্বোধন।
১৯শে	’’	শুক্রবার	দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সেমিনার।
২০শে	’’	শনিবার	দিল্লীতে পঞ্চপাণ্ডবের রাজধানী হস্তিনাপুর ও ইন্ডিয়া গেট, কুতুবমিনার আদি দর্শন।
২১শে	’’	রবিবার	বাসযোগে প্রয়াগ যাত্রা।
২২শে	’’	সোমবার	প্রয়াগে বিভিন্নতীর্থ দর্শন ও ত্রিবেণী স্নান।
২৩শে	’’	মঙ্গলবার	প্রাতেঃ কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন।

—ঃ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—

১। যাত্রীগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে—তাঁহারা যেন ৪ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে অন্ততঃপক্ষে অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং বাকী টাকা যাত্রার পূর্বে জমা দিয়া রসিদ গ্রহণ করিবেন। **“সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কোলকাতা-৩”**—এই নামে টাকা পাঠাইবেন। Draft অথবা Cheque **“GAUDIYA MISSION”**—এই নামে হইবে।

২। এই সময় অল্প শীত পড়ে, এইজন্য হাল্কা গরম পোষাক, হাল্কা বিছানা, ঘটী, বাটী ও টর্চ সঙ্গে লইবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ রাখিবেন। প্রতিবন্ধী, অতিবৃদ্ধ, অত্যাধিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া সম্ভব হইবে না।

৩। যাত্রাকালীন পরিচালক মণ্ডলীকে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করিতে প্রার্থনীয়। কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৯৪৩৩০১১৬২০ ফোনে যোগাযোগ করিতে প্রার্থনা।

৪। শুধুমাত্র ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতে ইচ্ছুক যাত্রীগণ নিজ খরচে ১০ই নভেম্বর বিকালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন এই ঠিকানায় অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন এবং পরিক্রমা দিল্লী উৎসবের শেষে নিজ নিজ খরচায় দিল্লী হইতে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিবেন। Rail টিকিট পূর্ব হইতে Book করিয়া লইবেন।